ভারতবর্ষ যে বিভিন্ন বস্তুর মূল্যের পার্থক্য অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছে এ কথা সত্য নয়, কারণ সে জানে এই চেষ্টা তার জীবনকে দুর্বিসহ ক'রে তুলবে। সৃষ্টির ক্রম-পর্যায়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তার মনের মধ্যে যে ছিল না তা নয়। কিন্তু যাতে তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে সে সম্বন্ধেও তার নিজের ধারণা ছিল। অধিকারের শক্তিতে নয় বরং এ ছিল ঐক্যের শক্তিতে। সেইজন্য ভারতবর্ষ সেই সমস্ত স্থানকেই তার তীর্থক্ষেত্র রূপে মনোনীত করেছিল যেখানে যেখানে প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ মহিমা বা সৌন্দর্য ছিল, তার ফলে তার মন জগতের সমস্ত সংকীর্ণ প্রয়োজনের থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল ও অসীমের মধ্যে নিজের স্থান উপলব্ধি করতে পেরেছিল। যারা একসময় মাংসাহারী ছিল, ভারতবর্ষের সেই সমস্ত জনসাধারণ পশু মাংস আহার কেন বর্জন করেছিল এ ছিল তার কারণ। এর মধ্যে দিয়ে তারা জীবনের প্রতি এক সর্বব্যাপী সহানুভূতির ভাব বাড়িয়ে তুলেছিল। মানব ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

ভারতবর্ষ জেনেছিল আমরা যখন শারীরিক ও মানসিক বাধার দ্বারা প্রকৃতির অফুরন্ত জীবন থেকে জোর ক'রে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করি, যখন আমরা মানুষ মাত্র হয়ে উঠি, বিশ্বের মানুষ হয়ে উঠি না তখন আমরা অনেক বিভ্রান্তিকর সমস্যার সৃষ্টি করি, আর তাদের সমাধানের উৎস বন্ধ ক'রে দিয়ে সমস্ত রকম কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করি। এই উপায়গুলি প্রত্যেকটি নিজেদের তৈরি করা সীমাহীন বাধা নিয়ে আসে। মানুষ বিশ্ব প্রকৃতিতে যখন তার বিশ্রামের জায়গা ছেড়ে দেয়, যখন সে মানবতার একমাত্র রজ্জুর উপর দিয়ে হেঁটে চলে, তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, হয় তার একটি নৃত্য, না হয় তার একটি পতন, তখন তাকে প্রতিটি পদক্ষেপের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রতিটি স্নায়ু ও পেশীকে টানটান ক'রে রাখতে হয়, তখন তার ক্লান্তির নানা বিরামের মধ্যে সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে

নিন্দায় সরব হয় আর সমগ্র পরিকল্পনায় তার সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে ভেবে এক প্রচ্ছন্ন গর্ব অনুভব করে ও সন্তুষ্ট হয়।

কিন্তু এই মনোভাব চিরকাল চলতে পারে না। মানুষকে তার অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা, অসীমের মধ্যে তার স্থান উপলব্ধি করতে হবে; তাকে জানতে হবে যে যত কঠিন চেষ্টাই সে করুক না কেন তার নিজের মৌচাকের কোষের মধ্যে সে মধু সৃষ্টি করতে পারবে না, কারণ কোষের দেওয়ালগুলির বাইরে থেকে তার নিজের জীবনদায়ী খাদ্যের অবিরাম সরবরাহ আসে। তাকে অবশ্যই জানতে হবে, অসীমের যে স্পর্শে মানুষ সজীব ও পবিত্র হয়ে ওঠে সেই স্পর্শের বাইরে যখন সে নিজেকে বন্ধ ক'রে রাখে, আর নিজের পুষ্টি ও আরোগ্যের জন্য শেষ উপায় রূপে নিজেরই উপর নির্ভর করে, তখন সে নিজেকে অঙ্কুশের আঘাতে উন্মত্ত ক'রে তোলে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, আর নিজের জীবনের সারাংশ নিজেই খেয়ে ফেলে। সমগ্রের পটভূমি থেকে বঞ্চিত হওয়ায়, তার দারিদ্র্য নিজের মহৎ গুণ সরলতাকে হারিয়ে ফেলে মলিন হয়ে যায় আর লজ্জায় অধোবদন হয়। তার ঐশ্বর্য আর উদার থাকে না; তা শুধুই অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে। তার বাসনাগুলি প্রয়োজনের সীমা রেখে জীবনে সহায়ক হয় না; তারা নিজেরাই লক্ষ্য হয়ে ওঠে ও তার জীবনে আগুন জ্বেলে দেয় আর সেই অগ্নিকাণ্ডের ভয়ঙ্কর আলোয় নিরর্থক সুর বাজানোর মতো তারা তুচ্ছ কর্ম করে। তার ফলে এই হয় যে আমাদের আত্মপ্রকাশে আমরা চমক দিতে চেষ্টা করি, আকর্ষণ করতে নয়; শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা মৌলিকতার জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করি আর প্রাচীন অথচ চিরনবীন সত্যের থেকে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি; সাহিত্যে আমরা মানুষের সরল অথচ মহৎ যে পরিপূর্ণ রূপ তা দেখতে পাই না। পরিবর্তে মানুষ এক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা রূপে কিংবা এক তীব্র অতএব অস্বাভাবিক মনোবিকারের প্রতিমূর্তি রূপে উপস্থিত হয়, এই মনোবিকার

প্রচণ্ড, কারণ শক্তিশালী কৃত্রিম আলোর চোখ ধাঁধানো দীপ্তিতে তাকে দেখানো হয়। মানুষের চৈতন্য যখন শুধুমাত্র তার মানবসত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য স্থায়ী ভূমিতে দৃঢ়মূল হয় না, তার আত্মা সব সময় প্রায়োপবেশনে থাকে আর সুস্থ কর্মশক্তির জায়গায় উত্তেজনায় সে আবর্তিত হয়। তখনই মানুষ তার আন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, এবং অসীমের সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের বদলে নিজের মহত্ত্বের পরিমাপ নিজের বিশাল আয়তন দিয়ে করে। নিজের কর্মের বিচার করে গতি দিয়ে, পরিপূর্ণতার প্রশান্তি দিয়ে নয়— এই প্রশান্তি রয়েছে তারা ভরা আকাশে, সৃষ্টির চির প্রবহমান ছন্দোময় নৃত্যে।

ভারতবর্ষের উপর প্রথম বহিরাক্রমণ ইয়োরোপীয় উপনিবেশকারীদের আমেরিকা আক্রমণের হুবহু সমান্তরাল। তাদেরও আদিম অরণ্যগুলির ও আদিম জাতিগুলির সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে মানুষে মানুষে ও মানুষে প্রকৃতিতে এই সংঘর্ষ চলেছিল শেষ পর্যন্ত; তারা কখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসেনি। ভারতবর্ষে যে অরণ্যগুলি বর্বরদের বাসস্থান ছিল, সেগুলি মুনিঋষিদের পবিত্র আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমেরিকাতে প্রকৃতির এই মহান প্রাণবন্ত গির্জাগুলির কোনো গভীরতর তাৎপর্য মানুষের কাছে ছিল না। তারা মানুষকে ঐশ্বর্য ও শক্তি এনে দিয়েছিল, হয়তো বা কখনো কখনো সৌন্দর্য উপভোগ করতে সাহায্য করেছিল, আর নিঃসঙ্গ কোনো কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা কখনোই সব মানুষের হৃদয়ে কোনো পবিত্র ভাব আনতে পারেনি। এই ভাব এমন কোনো মহান আধ্যাত্মিক সমন্বয় ক্ষেত্র প্রতিপাদন করতে পারেনি যেখানে মানবাত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার স্থান পায়।

সমস্ত কিছু অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল এমন ইঙ্গিত আমি এক মুহূর্তের

জন্যও দিতে চাইছি না। সর্বত্র একই ভাবে যদি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতো, তা হলে সমস্ত সুযোগের সম্পূর্ণ অপব্যবহার হতো। বিভিন্ন জায়গার মানুষেরা মানবতার বাণিজ্যকেন্দ্রে তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী অবশ্য নিয়ে আসবে এটাই হল পণ্য বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ ভাব, এই সামগ্রীগুলির প্রতিটি একে অন্যের পরিপূরক ও অত্যাবশ্যক। সার্বিক ভাবে আমি বলতে চাই ভারতবর্ষ তার অগ্রগতির শুরুতে বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত নানা অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, এই অবস্থাগুলি তার কাছে হারিয়ে যায়নি। সমস্ত রকম সুযোগ অনুযায়ী সে চিন্তা করেছে ও বিবেচনা করেছে, সংগ্রাম করেছে ও যন্ত্রণা ভোগ করেছে, অস্তিত্বের গভীরে ডুব দিয়েছে ও সকল মানুষের কাছে মূল্যহীন নয় এমন কিছু নিশ্চিত ভাবে পেয়েছে, ইতিহাসে এইসব মানুষের বিবর্তন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ নিয়েছিল। নিজের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য জীবন্ত সবকিছুকে মানুষের প্রয়োজন, এগুলি তার বহুমুখী জীবন গঠন করে; সেই কারণে নানা শস্যক্ষেত্রে তার খাদ্য উৎপন্ন হওয়া দরকার আর নানা উৎস থেকে তা আনা দরকার।

প্রত্যেক জাতি তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুযায়ী নরনারীদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার জন্য সভ্যতাকে নিজের মতো ক'রে এক ধরনের কাঠামোয় গড়ে তুলতে ব্যস্ত থাকে। তার সমস্ত প্রতিষ্ঠান, আইন পরিষদ, অনুমোদন ও দণ্ডাদেশের মাপকাঠি, সচেতন ও অসচেতন সমস্ত শিক্ষা এই লক্ষ্যাভিমুখী হয়। পশ্চিমের আধুনিক সভ্যতা, তার সমস্ত সংগঠিত প্রয়াসে, মানুষকে দেহগত, বুদ্ধিগত ও নীতিগত যোগ্যতায় সম্পূর্ণ ক'রে তোলার চেষ্টা করছে। সেখানে পারিপার্শ্বিকের উপরে ক্ষমতা বিস্তারের জন্য সমস্ত জাতি তাদের বিপুল কর্মশক্তি প্রয়োগ করছে, যত কিছুতে তাদের হাত পৌঁছায় সেই সব নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসার জন্য ও তাদের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য, তাদের জয়ের পথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করার জন্য, মানুষ প্রতিটি আয়াস সাধ্য কর্মোদ্যোগ সম্মিলিত

করছে। প্রকৃতির সঙ্গে ও অন্য সব জাতির সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য তারা সব সময় নিজেদের শিক্ষিত করছে; প্রতিদিন তাদের রণসজ্জা বিস্ময়কর ভাবে আরো প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে; তাদের সমস্ত যন্ত্রপাতির, তাদের সবরকম উপকরণের, তাদের সমস্ত সংগঠনের আশ্চর্যজনক ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। নিঃসন্দেহে, এ এক চমৎকার কীর্তি, আর মানুষের কর্তৃত্বের এক অপূর্ব প্রকাশ, এ কোনো বাধা জানে না আর সবকিছুর উপরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এর লক্ষ্য।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার পূর্ণতা সম্বন্ধে নিজস্ব এক আদর্শ ছিল, তার সমস্ত প্রচেষ্টা সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছিল। ক্ষমতা অর্জন তার লক্ষ্য ছিল না, অধিকন্তু সে তার সামর্থ্যের চরম উৎকর্ষ সাধনে অবহেলা করেছিল, অবহেলা করেছিল প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের প্রয়োজনে মানুষকে পরিচালিত করতে, অবহেলা করেছিল ধনদৌলত অধিগ্রহণে সহযোগিতা করার কাজে আর সামরিক ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে সংগঠিত করার কাজে মানুষকে পরিচালিত করতে। যে আদর্শ উপলব্ধি করতে ভারতবর্ষ সচেষ্ট ছিল, সেই আদর্শ তার শ্রেষ্ঠ মানবদের এক স্বতন্ত্র সমাহিত জীবনের পথ দেখিয়েছিল, আর সত্যের অন্তর্নিহিত রহস্য উপলব্ধি ক'রে সে মানবজাতির জন্য এক ঐশ্বর্য লাভ করেছিল, জাগতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে সেই ঐশ্বর্যের জন্য তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। তা হলেও, এ ছিল এক পরম প্রাপ্তি,— মানুষের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনো সীমা জানে না, এ ছিল তারই সর্বোচ্চ প্রকাশ আর এর লক্ষ্য অসীমের উপলব্ধি ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারতবর্ষে পুণ্যাত্মা, জ্ঞানী, শূর-বীরেরা ছিলেন; ছিলেন রাজনীতিবিদ, রাজা ও মহারাজারা; কিন্তু এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে মানুষের প্রতিনিধি রূপে সে কাকে দেখেছিল, আর বরণ করে নিয়েছিল?

তাঁরা ছিলেন ঋষি। ঋষিরা কী ছিলেন? তাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত হয়েছিলেন, আর তাঁকে আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে আন্তর সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে কৃতাত্মা হয়েছিলেন; তাঁকে হৃদয়ে উপলব্ধি ক'রে সমস্ত স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষার থেকে তাঁরা মুক্ত হয়ে বীতরাগ হয়েছিলেন, এবং সংসারের সমস্ত কর্মে তাঁকে দেখে প্রশান্ত হয়েছিলেন। তাঁরাই ছিলেন ঋষি যাঁরা সর্বত্র সর্বতোভাবে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে চির শান্তি লাভ ক'রে ধীর হয়েছিলেন, তাঁরা সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তাত্মা হয়েছিলেন, সকলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বিশ্বজীবনে আবিষ্ট হয়েছিলেন।[১]

এইভাবে সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ উপলব্ধি করা, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের মধ্যে দিয়ে সব কিছুতে প্রবেশ করা ভারতবর্ষে মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা বলে গণ্য করা হতো।

মানুষ বিনাশ করতে পারে ও কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে ও সঞ্চয় করতে পারে, উদ্ভাবন করতে পারে ও আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু সে মহান কারণ তার আত্মা সব কিছুকে অন্তরঙ্গ করতে পারে। যখন সে তার আত্মাকে অনমনীয় অভ্যাসের নিষ্প্রাণ আবরণে ঢেকে রাখে, আর যখন কর্মের অন্ধ উত্তেজনা তার চারপাশে ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ের মতো আবর্তিত হয়ে দিকচক্র অবরুদ্ধ ক'রে দেয় তখনই তার শোচনীয় বিনাশ। নিঃসন্দেহে এ তার অস্তিত্বের প্রকৃত মর্ম, তার অন্তরঙ্গতার মর্মকে বিনাশ করে। মূলত মানুষ তার নিজের অথবা জগতের ক্রীতদাস নয়; বরং সে একজন প্রেমিক। প্রেমেই রয়েছে তার স্বাধীনতা ও সার্থকতা, এর অন্য নাম সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গতা। এই অন্তরঙ্গতার শক্তিতে, তার সত্তার এই পরিব্যাপ্তিতে, সে সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, তিনি তার প্রাণাত্মাও। যেখানে মানুষ অন্য সকলকে ঠেলে দিয়ে ও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেকে বড় করার চেষ্টা করে, এমন এক বৈশিষ্ট্য লাভ করতে চায়,

যাতে সে অন্য সকলের থেকে বেশী ক'রে নিজের সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করতে পারে, সেখানে সে সেই পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই কারণে যাঁরা মানবজীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন, উপনিষদ তাঁদের "প্রশান্ত"[২] ও 'যুক্তাত্মা'[৩] বলে বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ তাঁরা প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে গেছেন, আর এর ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁদের মিলন নিরুপদ্রব থেকেছে।

আমরা এই একই সত্যের আভাস পাই যিশুর উপদেশাবলির মধ্যে যখন তিনি বলেন, "একজন ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার থেকে একটি উটের পক্ষে একটি সূচের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া অনেক সহজ"— এর তাৎপর্য হলো আমরা নিজেদের জন্য যা কিছু ধন-সঞ্চয় করি, অন্যের থেকে তা আমাদের স্বতন্ত্র করে; আমাদের সঞ্চিত সম্পদ আমাদের সীমাবদ্ধতা। ধনসম্পদ রাশীকৃত করতে যে ঝুঁকে পড়েছে, তার অহংকার সর্বক্ষণ স্ফীত হয়ে ওঠায় সে আধ্যাত্মিক জগতের অন্তরঙ্গতার দ্বার দিয়ে যেতে পারে না, সেই জগৎ পূর্ণ সমন্বয়ের জগৎ; তার পরিমিত সঞ্চয়ের সংকীর্ণ দেওয়ালগুলির মধ্যে সে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে।

সেইজন্য উপনিষদের সমস্ত শিক্ষার মূলভাব হলো: তাঁর সাক্ষাৎ পেতে হলে তোমায় সকলকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে হবে। ধন অর্জনের প্রচেষ্টায় আসলে তুমি সামান্য কিছু প্রাপ্তির জন্য সবকিছুই ত্যাগ করছো, যিনি পরিপূর্ণ তাঁকে পাওয়ার পথ এটি নয়।

ইয়োরোপের কিছু আধুনিক দার্শনিক যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপনিষদের কাছে ঋণী, তাঁরা নিজেদের ঋণ উপলব্ধি করা দূরে থাক, এমন মত পোষণ করেন যে ভারতবর্ষের ব্রহ্ম এক বিমূর্ত ভাব মাত্র, জগতে যা কিছু আছে তা অস্বীকার করার ভাব। এক কথায়, অধিবিদ্যা ছাড়া এই অনন্ত সত্তাকে

আর কোথাও পাওয়া যায় না। হতে পারে, এমন এক মতবাদ আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যেও প্রভাবশীল ছিল ও এখনো আছে। কিন্তু ভারতীয় মনের সর্বব্যাপী ভাবের সঙ্গে এ কখনোই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তার বদলে, সমস্ত কিছুর মধ্যে অসীমের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা আর তার সত্যতা সমর্থন করাই ভারতবর্ষের রীতি ও তার চিরকালের প্রেরণা।

জগতে যা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত[৪] বলে দেখবে এই উপদেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্ব ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বার-বার নমস্কার করি।[৫]

এই ঈশ্বর কি জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবমূর্তি হতে পারেন? পরিবর্তে এর তাৎপর্য হলো, তাঁকে শুধু সব কিছুর মধ্যে দর্শন করা নয়, জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে তাঁকে নমস্কার জানানো। উপনিষদের ঈশ্বর-সচেতন মানুষের জগৎ সম্বন্ধীয় ধারণা গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ। সর্বত্র তার পূজার বিষয় রয়েছে। এক জীবন্ত সত্য সমস্ত বস্তুকে সত্য ক'রে তোলে। এই সত্য শুধু মাত্র জ্ঞানের নয় ভক্তিরও। 'নমোনমঃ',— আমরা তাঁকে সর্বত্র প্রণাম জানাই ও বার-বার জানাই। এর স্বীকৃতি পাওয়া যায় সেই ঋষির উচ্ছ্বসিত উক্তিতে, যিনি সমস্ত বিশ্বকে উদ্দেশ ক'রে পরমানন্দে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, অমৃতের পুত্র তোমরা বিশ্ববাসী, তোমরা যারা দিব্যধামবাসী শ্রবণ করো, আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি, যিনি আদিত্যবর্ণ, অন্ধকারের পরপার থেকে যাঁর জ্যোতি বিচ্ছুরিত।[৬] সাক্ষাৎ ও ইতিবাচক এই উক্তিতে আমরা কি সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ খুঁজে পাই না যেখানে অস্পষ্টতা বা নিষ্ক্রিয়তার কোনো চিহ্ন নেই?

বুদ্ধদেব উপনিষদের শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের বিকাশ ক'রে একই উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'যা কিছু উচ্চ বা নীচ, দূর বা নিকট, গোচর বা অগোচর,

সমস্ত কিছুর প্রতি তুমি শত্রুতাহীন অথবা জিঘাংসাহীন অপরিমিত প্রেমের সম্বন্ধ রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছো বা চলছো, বসে আছো বা শুয়ে আছো যে পর্যন্ত নিদ্রা না আসে, সে পর্যন্ত এই সচেতনতার মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে বলে ব্রহ্মবিহার, অথবা, অন্য ভাবে বললে, এ হলো ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবের মধ্যে জীবন যাপন করা ও বিচরণ করা আর ব্রহ্মের ভাবের মধ্যে আনন্দ পাওয়া।

সেই ভাবটি কী? উপনিষদ বলছেন, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন, তিনি ব্রহ্ম।[৭] সবকিছু অনুভব করা, সমস্ত বিষয়ে সচেতন থাকা হলো তাঁর ভাব। দেহে ও মনে আমরা তাঁরই চেতনায় মগ্ন। তাঁরই চেতনার মধ্যে দিয়ে সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে; তাঁর চেতনার মধ্যে দিয়ে আলোক-তরঙ্গ গ্রহ হতে গ্রহান্তরে তরঙ্গিত হচ্ছে।

শুধুমাত্র আকাশে নয়, এই তেজোময় ও অমৃতময়, এই সর্বানুভূ ব্রহ্ম আমাদের আত্মাতেও বিরাজমান।[৮] তিনি আকাশে বা ব্যাপ্তির রাজ্যে সর্বানুভূ; এবং তিনি আত্মাতে অথবা গভীরতার রাজ্যে সর্বানুভূ।

কাজেই বিশ্ব-চেতনা লাভ করতে হলে, আমাদের অনুভূতিকে এই সর্বব্যাপী অনন্ত অনুভূতির সঙ্গে মেলাতে হবে। বস্তুতঃ, মানুষের একমাত্র যথার্থ উন্নতি এই অনুভূতির সীমা বিস্তারের সঙ্গে সমান্তরাল। আমাদের সমস্ত কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও ধর্ম আমাদের অনুভূতির সীমাকে উন্নততর ও বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত করছে। মানুষ বিস্তৃততর জায়গা দখল ক'রে অধিকার অর্জন করে না, বাইরের ব্যবহারের দ্বারাও করে না, বরং যে পর্যন্ত সে সত্য সেই পর্যন্ত তার অধিকার প্রসারিত হয়, আর তার সত্যতার পরিমাপ হয় তার অনুভূতির প্রসারে।

তা সত্ত্বেও, এই অনুভূতির স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে আমাদের কিছু মূল্য

দিতে হবে। কি সেই মূল্য? তা হলো নিজের সত্তাকে দিয়ে দেওয়া। আমাদের আত্মা যথার্থ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে একমাত্র আত্মত্যাগ ক'রে। উপনিষদ বলছেন, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো,[৯] লোভ কোরো না।[১০]

গীতায় সমস্ত ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে আমাদের নিরাসক্ত কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বহিরাগত অনেকেই এই শিক্ষার থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে ভারতবর্ষে এই যে তথাকথিত নিরাসক্তির উপদেশ দেওয়া হয় তার মূলে রয়েছে জগৎ কোনো মিথ্যা বস্তু এই ধারণা। কিন্তু প্রকৃত সত্য এর বিপরীত।

যে মানুষের লক্ষ্য নিজেকে বড় ক'রে দেখা, সে আর সব কিছুকেই ছোট করে। নিজের সঙ্গে তুলনায় জগতের বাকি সব কিছুই তার কাছে মিথ্যা। তাই সবকিছুর সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হতে হলে, মানুষকে ব্যক্তিগত সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য—সঙ্গীদের সঙ্গে দায়দায়িত্ব ভাগ ক'রে নেওয়ার জন্য এই নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এক বৃহত্তর জীবনের জন্য মানুষের প্রতিটি প্রচেষ্টায় "ত্যাগের দ্বারা ভোগ", ও "লোভ না করার" আবশ্যকতা আছে। আর তাই সকলের সঙ্গে নিজের ঐক্যবোধকে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত করাই মনুষ্যত্বের সুকঠোর প্রচেষ্টা।

ভারতবর্ষে অসীম কখনোই এক তুচ্ছ অস্তিত্বহীন সকল পদার্থের শূন্যতা নয়। ভারতবর্ষের ঋষিরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, "ইহজগতে তাঁকে বিদিত হওয়াই সত্য। ইহজগতে তাঁকে বিদিত না হওয়া মহাবিনাশ।"[১১] তা হলে তাঁকে জানা যায় কি ভাবে? "সর্বভূতে তাঁকে উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে।"[১২] শুধুমাত্র প্রকৃতিতে নয়, কিন্তু পরিবারে, সমাজে, ও রাষ্ট্রে, যতই সবকিছুর মধ্যে সর্বানুভূকে আমরা উপলব্ধি করবো, ততই আমাদের মঙ্গল। এই উপলব্ধি করতে অসমর্থ হলে, আমরা ধ্বংসাভিমুখী হয়ে যাব।

যখন উপলব্ধি করি সুদূর অতীতে এমন এক সময় ছিল আমাদের ক্রান্তদর্শী কবিরা যখন ভারতের রৌদ্রসমুজ্জ্বল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে আত্মীয় বলে আনন্দের সঙ্গে চিনতে পেরে বন্দনা করেছিলেন তখন মানবজাতির ভবিষ্যৎ ভেবে আমি মহা আনন্দে এক উচ্চ আশায় ভরে উঠি। এখানে অলীক কোনো কিছুতে নরত্ব আরোপ করা হয়নি। সবকিছুতে মানুষের অতিরঞ্জিত অদ্ভূত প্রতিফলন দেখা যায়নি, আর প্রকৃতির রঙ্গশালায় সঞ্চলমান আলো আঁধারে বিরাট মাত্রায় মানুষের জীবননাট্য প্রত্যক্ষ করাও হয়নি। অন্যভাবে, এর অর্থ ছিল ব্যক্তিগত সীমার বেড়া অতিক্রম ক'রে, মানুষের থেকে আরো বড় হয়ে, অসীমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠা। এ কল্পনার খেলা মাত্র ছিল না, বরং এ ছিল ব্যক্তিসত্তার রহস্য ও অতিরঞ্জন থেকে নিজের চেতনার মুক্তি। এই প্রাচীন ঋষিরা তাঁদের প্রশান্ত অন্তরের গভীরে অনুভব করেছিলেন একই শক্তি যা জগতের অনন্ত রূপের মধ্যে স্পন্দিত ও অনুস্যূত হচ্ছে, তাই চেতনা রূপে আমাদের অন্তরাত্মায় নিজেকে প্রকাশ করছে; আর এই ঐক্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। পূর্ণতা সম্বন্ধে এই ঋষিদের প্রাঞ্জল দৃষ্টিতে কোনো ফাঁক ছিল না। এমনকি মৃত্যু বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো শূন্যতা সৃষ্টি করছে বলে তাঁরা স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেছিলেন, মৃত্যু তাঁর ছায়া, যেমন তাঁর ছায়া অমরত্ব।[১৩] জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ তাঁরা স্বীকার করেননি, আর তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, মৃত্যুই প্রাণ।[১৪] তাঁরা একই রকম প্রশান্ত আনন্দে নমস্কার জানিয়েছিলেন জীবনে যা কিছু অবভাসমান তাকে আর যা প্রয়াত হয়েছে তাকে— অতীত গুহাহিত হয়ে আছে জীবনে, আর জীবনের মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যৎ।[১৫] তাঁরা জানতেন যে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো আবির্ভাব ও তিরোভাব রয়েছে উপরের স্তরে, কিন্তু যে জীবন নিত্য তার কোনো ক্ষয় নেই বা অপচয় নেই।

এই জগতে যা কিছু সবই অমৃত, প্রাণের থেকে নিঃসৃত আর প্রাণেই তরঙ্গায়িত,[১৬] কারণ প্রাণ বিরাট।[১৭]

এই মহান উত্তরাধিকার আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এসেছে, এ হলো চেতনার পরম মুক্তির আদর্শ, তাকে আমরা নিজস্ব ক'রে নেবো এই অপেক্ষা রয়েছে। এ শুধুমাত্র বুদ্ধিগত বা আবেগপ্রবণ ভাব নয়, এর এক নৈতিক ভিত্তি আছে, আর তা আমাদের কর্মে রূপান্তরিত করতে হবে। উপনিষদে বলা হয়েছে, সেই ভগবান সর্বব্যাপী, সেইহেতু তিনি সর্বগত ও মঙ্গল।[১৮] জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে সমস্ত জীবের সঙ্গে যথার্থ ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও এইভাবে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মধ্যে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা হলো মঙ্গলের মূল তাৎপর্য, আর উপনিষদের শিক্ষার এই হলো মূল সুর: প্রাণ বিরাট।[১৯]

তথ্যসূত্র

১. সম্প্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তা। কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ॥
তে সর্বগতঃ সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ। যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

২. প্রশান্তঃ

৩. যুক্তাত্মানঃ

৪. ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

৫. যো দেবোগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

৬. শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্। আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

৭. যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।

৮. যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।

৯. ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা

১০. মা গৃধঃ

১১. ইহচেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি। ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।

১২. ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য।

১৩. যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

১৪. প্রাণো মৃত্যুঃ

১৫. নমো অস্তু আয়তে নমো অস্তু পরায়তে। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ।

১৬. যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

১৭. প্রাণো বিরাট

১৮. সর্বব্যাপী স ভগবান সর্বগতঃ শিবঃ।

১৯. প্রাণো বিরাট